রাজস্থান গ্রন্থমালা—সপ্তম গ্রন্থ

চণ্ড

'দানবীর কার্নেগী', 'নতুন আলো', 'হেন্‌রী ফোর্ড', 'শিলাদিত্য', 'মহারাজ গোহ', 'বাপ্পাদিত্য', 'সমরসিংহ' প্রভৃতি শিশুপাঠ্য গ্রন্থ-প্রণেতা

শ্রীপরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, বি.এস্‌-সি.

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড

চণ্ড

এক

চিতোরের রাজ-দরবার।

বৃদ্ধ রাণা লক্ষসিংহ সিংহাসন আলো করিয়া বসিয়াছেন। তাঁহার পক্ক শ্মশ্রু ও পক্ক কেশের মধ্য হইতেও অতীত যৌবনের বীরত্ব-ব্যঞ্জনা ফুটিয়া উঠিয়াছে!

মন্ত্রী, সেনাপতি, পাত্রমিত্র প্রভৃতি যথাযোগ্য আসনে মহারাণার আদেশ শ্রবণের আশায় উপবিষ্ট। তাঁহাদের মুখেও রাজপুত-সুলভ বীরত্বের দীপ্তি শোভা পাইতেছে।

চারণ কবিরা এইমাত্র মহারাণার বন্দনা গান গাহিয়া গিয়াছে। সে গানের মূর্ছনা তখনও সভাগৃহে ঝঙ্কৃত হইতেছিল। সে সুরে—মেবারের সেই গৌরব-গাথায় সভাস্থ সকলের হৃদয় তখনও পরিপূর্ণ।

রাণা রাজকার্য আরম্ভ করিবেন, এমন সময় প্রতিহারী আসিয়া সংবাদ দিল, মারবার রাজ্যের রাজদূত মহারাণার দর্শন-প্রার্থী।

রাণার আদেশে রাজদূতকে সসম্মানে সভাগৃহে আনয়ন করা হইল। তাঁহার হাতে একটি রৌপ্যমণ্ডিত নারিকেল ফল।

রাণাকে যথাযোগ্য অভিবাদনের পর দূত বলিলেন, "মহারাণা! মারবার-রাজ রণমল্ল এই নারিকেল ফলটি প্রেরণ করিয়াছেন। মারবার-রাজকুমারী বিবাহযোগ্যা। যুবরাজ চণ্ডও প্রাপ্ত-বয়স্ক। মহারাজ রণমল্লের ইচ্ছা, মহারাণা আমাদের রাজকুমারীকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করেন!"

ধনে মানে কুলে শীলে মারবার চিতোরের সমান ঘর। কাজেই এ বিবাহের প্রস্তাবে রাণা লক্ষসিংহের কোন আপত্তি হইবার কথা নয়। তিনি সানন্দে দূতকে বলিলেন, "তোমার রাজাকে বলিও, এ প্রস্তাবে আমার পূর্ণ সম্মতি আছে। মারবার-পতি যেন সত্বরই শুভকার্যের দিন স্থির করেন।"

রাণা গলা হইতে আপন মণিময় হার খুলিয়া দূতকে উপহার প্রদান করিলেন। দূত রাণার সে উপহার সসম্মানে গ্রহণ করিলেন। সভামধ্যে আনন্দের গুঞ্জন-ধ্বনি উঠিল।

যুবরাজ চণ্ডের বিবাহ! কত আনন্দ, কত উৎসব, কত সমারোহ হইবে! যুবরাজ তাঁহার মধুর স্বভাবের গুণে রাজ্যের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই প্রিয়পাত্র ছিলেন। যুবরাজের কথায় তাঁহারা প্রাণদানেও কুণ্ঠিত হইতেন না। শুধু কি মধুর স্বভাব! রাজপুত রাজ্যে তখন চণ্ডের মত বীরপুরুষ একটিও ছিল না। তাঁহার হাতের তরবারি হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইত। মেবার-গৌরব সেই যুবরাজের বিবাহ! মেবারবাসীর পরম প্রিয় প্রিয়দর্শী চণ্ডের বিবাহ! পাত্রমিত্র সভাসদ্ পৌরজন সকলেই উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন।

যুবরাজ চণ্ড তখন সভাগৃহে উপস্থিত ছিলেন না। তাঁহার মুখ হইতে সম্মতি-সূচক উত্তরের আশায় মারবার-দূত উৎসুক হৃদয়ে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সভাস্থ সকলেও যুবরাজের আগমন আশায় বারবার দ্বারপথে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

রাণা লক্ষসিংহ বৃদ্ধ হইয়াছেন, বার্ধক্যের সহিত তাঁহার দৈহিক শক্তি হ্রাস পাইয়াছে, শত্রু-সৈন্যের মাথা কাটিতে কাটিতে তাঁহার তরবারির ধার কমিয়া আসিয়াছে, কিন্তু তখনও তাঁহার কথার ধার একবিন্দুও কমে নাই; তাঁহার অন্তরে যে রহস্য-প্রিয় যুবকটি বর্তমান ছিল, বার্ধক্য তাহাকে স্পর্শও করিতে পারে নাই।

তাই তিনি রাজদূতের সহিত রহস্যালাপ আরম্ভ করিয়া দিলেন। কৌতুক-হাস্যে বলিলেন, "মারবারের রাজদূত! আমি ভেবেছিলাম, মহারাজ রণমল্ল বুঝি আমার জন্যই নারিকেল ফলটি প্রেরণ করিয়াছেন! হায়রে বৃদ্ধের দুরাশা!"

তাঁহার বলিবার ভঙ্গী দেখিয়া সভায় হাসির তরঙ্গ খেলিয়া গেল।

রাজদূতের মুখে হাসি, মন্ত্রীর মুখে হাসি, সেনাপতির মুখে হাসি, একজন হাসিয়া আর একজনের গায়ে ঢলিয়া পড়ে। সকলেই রাণার এ পরিহাসে কৌতুক উপভোগ করিতে লাগিল।

অকস্মাৎ সকলের হাসি থামিয়া গেল। দেখা গেল, যুবরাজ চণ্ড রাজসভায় প্রবেশ করিতেছেন। তাঁহার বীরত্ব-ব্যঞ্জক মূর্তি, তাঁহার কমনীয় দেহ-লাবণ্য, ভাস্বর সূর্যের মত তাঁহার উজ্জ্বল দীপ্তি!—তাঁহার আগমনে সভাগৃহ যেন নূতন সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল! সকলের মুখেই নূতন আনন্দের নবীন দীপ্তি শোভা পাইতে লাগিল।

যুবরাজ মহারাণাকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিলে, লক্ষসিংহ তাঁহাকে সস্নেহে বলিলেন, "বৎস! মারবার-অধিপতি রণমল্ল তাঁহার কন্যার সহিত তোমার বিবাহ-প্রস্তাব করিয়া এই নারিকেল ফল প্রেরণ করিয়াছেন। মারবার-দূত তোমার উত্তরের আশায় প্রতীক্ষা করিতেছেন।"

যুবরাজ নত নয়নে নীরবে বসিয়া রহিলেন, তাঁহার মুখ হইতে কোন উত্তর বাহির হইল না।

দূতের মুখ মলিন হইয়া গেল, সভাস্থ সকলে বিস্মিত হৃদয়ে যুবরাজের দিকে চাহিয়া রহিলেন, বৃদ্ধ রাণার অন্তর ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

তিনি ভাবিলেন, যুবরাজ বুঝি বিবাহের প্রসঙ্গে লজ্জা বোধ করিতেছেন। তাই মৃদুহাস্যে বলিলেন, "তুমি এখন বয়ঃপ্রাপ্ত, ইহাতে লজ্জিত হইবার কিছুই নাই। মুখ ফুটিয়া তোমার অভিমত প্রকাশ কর বৎস! আমাদের উৎকণ্ঠা দূর কর।"

যুবরাজ চণ্ড এইবার মুখ তুলিয়া চাহিলেন। ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমাকে ক্ষমা করুন পিতা, এখানে বিবাহ করিতে আমি অক্ষম।"

বৃদ্ধ রাণা পুত্রের উত্তর শুনিয়া যেন আকাশ হইতে পড়িলেন, রাজদূতের মুখ শুকাইয়া গেল, সভাস্থ সকলে চিত্রার্পিত প্রায় হইয়া রহিল।

যুবরাজ বলিলেন, "মহারাণা! সভা-প্রবেশকালে আমি স্বকর্ণে আপনাকে এ কন্যা যাচ্ঞা করিতে শুনিয়াছি। পিতা যাঁহাকে কামনা করেন, তিনি আমার জননী-তুল্যা, পত্নীরূপে তাঁহাকে কল্পনা করাও মহা পাপ! আমাকে সে পাপভাগী হইতে আদেশ করিবেন না!"

রাণার বুক হইতে যেন একটা পাষাণভার নামিয়া গেল। তিনি সস্মিত হাস্যে বলিলেন, "ওঃ, এই কথা! সে ত' রহস্যালাপ মাত্র! রাজ-দূতের সহিত আমি রহস্য করিতেছিলাম। এ রহস্যের আবার মূল্য কি?"

মারবার-দূতের অন্তরও এতক্ষণে আশ্বস্ত হইয়া উঠিয়াছে। তিনিও বলিলেন, "মারবার-পতি এ নারিকেল ফল আপনার উদ্দেশেই প্রেরণ করিয়াছেন, যুবরাজ!"

রাণাও বলিলেন, "সে রহস্যের কথা বিস্মৃত হও বৎস! এ ফল গ্রহণ কর।"

তথাপি যুবরাজের মুখে সেই একই কথা।—"রহস্যচ্ছলেও পিতা যাঁহাকে কামনা করিতে পারেন, পুত্রের নিকট তিনি প্রণম্যা। পিতা, আপনিই এ কুমারীকে বিবাহ করুন, চিরজীবন আমি তাঁহাকে জননীর মত পূজা করিব।"

রাণা কত বুঝাইলেন, সভাসদ্ সকলে কত যুক্তি প্রদর্শন করিলেন, কিন্তু যুবরাজের মুখে সেই একই উত্তর!

বৃদ্ধ রাণা উভয়-সঙ্কটে পড়িলেন। এদিকে পুত্রের দৃঢ় সঙ্কল্প—বিবাহে অনিচ্ছা! অন্যদিকে নারিকেল ফল গ্রহণ না করিলে, মারবার-অধিপতির অবমাননা!

অবশেষে রাণা বিষণ্ণ হাস্যে দূতকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "অদৃষ্টের লেখা কে খণ্ডন করিবে? মারবার-রাজকে আমার অভি-বাদন জানাইয়া বলিও, তাঁহার এ ফল আমিই গ্রহণ করিলাম।"

যুববাজ চণ্ড সভাগৃহ পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছিলেন; রাণা

তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "এত সাধ্য-সাধনায়ও যখন তুমি আমাদের কথায় কর্ণপাত করিলে না, তখন জানিয়া রাখ, মারবার-কুমারীর গর্ভে যদি আমার কোন পুত্র-সন্তান জন্মে, তবে সে-ই মেবার-সিংহাসনের অধিকারী হইবে, উহাতে তোমার কোন অধিকার থাকিবে না। উপস্থিত সমস্ত সামন্ত ও সর্দারগণ ইহার সাক্ষী রহিলেন।"

যুবরাজ পিতার চরণ বন্দনা করিয়া বলিলেন, "পুত্রের নিকট পিতার মুখের কথাই যথেষ্ট, অন্য সাক্ষী নিষ্প্রয়োজন। দেবাদিদেব একলিঙ্গের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি—আমার সেই ভাগ্যবান্ ভ্রাতাই চিতোরেশ্বর হইবেন, আমি তাঁহার অধীনে একজন সাধারণ সামন্ত হইয়া থাকিব।"

চণ্ডের এই শপথ-বাক্য শুনিয়া রাণা স্তম্ভিত, রাজদূত চমকিত, সভাসদ্‌গণ বিস্ময়-বিমূঢ় হইলেন।

মারবার-দূত বিদায় লইলেন। রাণাও সভাভঙ্গের আদেশ দিলেন। সেদিন আর কোন রাজকার্যই হইল না। এই অভাবনীয় ঘটনাচক্রে, যুবরাজ চণ্ডের এই আকস্মিক ভাগ্য-বিবর্তনে মেবারবাসী সকলের হৃদয়েই বিষাদের ছায়াপাত হইল!

দুই

নির্দিষ্ট দিনে মারবার-রাজকুমারীর সহিত রাণা লক্ষসিংহের বিবাহ হইয়া গেল। প্রজাপতির পরিহাসে রাণাকে আবার এই বৃদ্ধ বয়সে বিবাহের টোপর পরিতে হইল। মারবার-কুমারী চিতোর-মহিষী হইয়া মেবারে পদার্পণ করিলেন।

যুবরাজ চণ্ডই সর্বপ্রথমে নূতন মায়ের চরণ বন্দনা করিতে গেলেন, কিন্তু চণ্ডের উপর তাঁহার প্রসন্ন আশীর্বাদ বর্ষিত হইল না।

রণমল্ল-তনয়া তাঁহার সখীদের মুখে শুনিয়াছিলেন, তাঁহার পিতা চণ্ডের উদ্দেশেই নারিকেল ফল প্রেরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু চণ্ড তাহা

গ্রহণ না করার ফলেই বৃদ্ধ রাণা লক্ষসিংহের গলে তাঁহাকে বরমাল্য অর্পণ করিতে হইয়াছে।

—কিন্তু চণ্ডের উপর তাঁহার প্রসন্ন আশীর্বাদ বর্ষিত হইল না।

তিনি ত' আর সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতেন না! তিনি ধরিয়া নিয়াছিলেন যে, অহঙ্কারী যুবরাজ অহঙ্কার বশতঃই তাঁহার প্রতি অবহেলা

প্রদর্শন করিয়াছেন। তাই চণ্ডের প্রতি ভিতরে ভিতরে তিনি তীব্র ক্ষোভ পোষণ করিতে লাগিলেন। চণ্ড তাহা ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিলেন না।

মারবার-কুমারী লক্ষসিংহকে পতিরূপে পাইয়া যে খুব অসুখী হইয়াছিলেন, তাহা নহে। রাজপুত-নারী সকল সময়ই বীরত্বের পূজারিণী! বীর পতি কামনা করিয়াই রাজপুত কুমারীরা শিবপূজা করিয়া থাকে। রাণা লক্ষসিংহেরও বীরত্বের অভাব ছিল না। তাঁহার প্রতাপে শত্রু-হৃদয় সর্বদা কম্পিত থাকিত, তাঁহার সুতীক্ষ্ণ তরবারির আস্ফালনে শত্রুসেনা ভয়ে পলায়ন করিত।

সুদীর্ঘ ৬২ বৎসরকাল রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়া হামির মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, তৎপুত্র ক্ষেত্রসিংহ মেবারের সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাণা লক্ষসিংহ তাঁহারই সুযোগ্য পুত্র, মহাবীর হামিরের সুযোগ্য বংশধর। লক্ষসিংহের শৌর্য-বীর্য ও কীর্তি-কলাপের কথা স্মরণে মেবারবাসী আজিও গৌরব বোধ করিয়া থাকেন।

স্থাপত্য-বিদ্যায়ও তাঁহার সবিশেষ অনুরাগ ছিল। আলাউদ্দিনের অত্যাচারে মেবার একবারে শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল। মহাবীর হামির স্বীয় প্রতাপে মুসলমানের হাত হইতে সে শ্মশানের উদ্ধার করেন বটে, কিন্তু রাণা লক্ষসিংহই সেই শ্মশান-ভস্মের উপর আবার নূতন অমরাবতী নির্মাণ করেন। তিনি চিতোরে বহুসংখ্যক অট্টালিকা, সরোবর, দেবমন্দির ইত্যাদি নির্মাণ করিয়া চিতোরের সৌন্দর্য ও গৌরব বৃদ্ধি করেন। তাঁহার রাজত্বকালেই চিতোর আবার স্বর্ণপ্রসূ হইয়া উঠে।

রাণা লক্ষসিংহ যে নিষ্কণ্টকে রাজ্যশাসন করিয়াছেন, তাহা নহে। মুসলমানের আক্রমণে মাঝে মাঝে তাঁহাকে উপদ্রুত হইতে হইয়াছিল। তাঁহার রাজত্বকালেই দিল্লীর সম্রাট্ মহম্মদ শাহ্ লোদীর লোলুপ দৃষ্টি একবার চিতোর রাজ্যের উপর পতিত হয়। চিতোর-জয়ের আশা লইয়া

তিনি অগণিত সৈন্যসহ চিতোরের উপর আপতিত হইলেন, কিন্তু রাণা লক্ষসিংহের বিক্রমে মুসলমান অক্ষৌহিণী নিমেষে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল ! মহম্মদ শাহ পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচাইলেন।

এমন বীর স্বামী পাইয়া, এমন বীর-মহিষী হইয়া নূতন রাণীর দিন বেশ সুখেই কাটিতে লাগিল। রাজ-অন্তঃপুরের সকলেই তাঁহার সদ্ব্যবহারে পরিতুষ্ট হইয়া উঠিল, শুধু যুবরাজ চণ্ডই তাঁহার দুই চক্ষের বিষ হইয়া রহিলেন।

কালক্রমে রাণীর গর্ভে এক পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তাহার নাম রাখা হইল মুকুল। কুসুম-মুকুলের মত সুন্দর, কুসুম-কোরকের মতই কোমল, সেই শিশুকে যে দেখিত, সে-ই ভালবাসিত। এমনই ছিল ক্ষুদ্র শিশুর কৃষ্ণ নয়নের কাজল-মায়া! চণ্ডও তাহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন। শিশু মুকুলও চণ্ডের একান্ত অনুগত হইয়া উঠিল।

রাণার শরীর দিন দিনই বার্ধক্যের আক্রমণে ভাঙ্গিয়া আসিতেছিল। তাই মুকুল যখন পাঁচ বৎসরের শিশু, তখন তিনি তাঁহার অভিষেকের আয়োজন করিলেন। ইচ্ছা, মুকুলকে সিংহাসনে বসাইয়া তিনি তীর্থে তীর্থে বাকী জীবন অতিবাহিত করিবেন।

মুকুলের অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল, কিন্তু তাঁহার দ্বিতীয় ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। এ সময় মুসলমানগণ গয়াধাম আক্রমণ করিলে লক্ষসিংহ সে আক্রমণ হইতে হিন্দুর পবিত্র তীর্থকে রক্ষা করিতে গিয়া আত্ম-প্রাণ বিসর্জন দিলেন। এইভাবে বীরের জীবনের বীরোচিত পরিসমাপ্তি ঘটিল।

তিন

মুকুলজী চিতোর-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে চণ্ডই ভাইয়ের হইয়া রাজকার্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। পাঁচ বৎসরের শিশু মুকুল,—সিংহাসনে চুপ করিয়া বসিয়া থাকা অপেক্ষা ধাত্রীমার সহিত খেলা করিতেই ভালবাসিত।

চণ্ডের পরিচালনায় রাজকার্য বেশ শৃঙ্খলার সহিতই চলিতে লাগিল। চণ্ড চিতোরবাসীর প্রাণ, সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত, ভালবাসিত। সকলের মুখেই চণ্ডের প্রশংসা, সৈন্যসামন্ত সকলেই চণ্ডের বশ, এমন কি, মুকুল পর্যন্ত দাদার নামে অজ্ঞান।

চারণ কবিরা চণ্ডের জয়গানে আকাশ-বাতাস মুখর করিয়া তুলেন, বুদ্ধিভ্রংশ বশতঃই বৃদ্ধ রাণা যুবরাজ চণ্ডকে সিংহাসন হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন বলিয়া চিতোরের সামন্তেরা মৃত রাণার নামে ধিক্কার দেন, চণ্ড সিংহাসনে বসিতে পারিলেন না বলিয়া চিতোরের পুরনারীরা পর্যন্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন।

চণ্ডের নিজের কোন বিষয়েই ভ্রূক্ষেপ নাই, তাঁহার সম্বন্ধে এ সকল আলোচনা-সমালোচনায় তিনি সম্পূর্ণ নির্বিকার। পিতার নিকট তিনি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, শুধু তাহাই সর্বদা স্মৃতিপথে সজীব রাখিয়া তিনি মুকুলজীকে চিতোরের রাণাপদের উপযুক্ত করিয়া তুলিবার চেষ্টায় তন্ময়। চিতোরের মঙ্গল-সাধন, চিতোরের মর্যাদা-রক্ষাই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য।

কিন্তু চণ্ডের এই প্রতিষ্ঠা একজনের সহ্য হইত না, তিনি মুকুলের জননী। চিতোরবাসীদের মুখে চণ্ডের এই জয়গান যেন তাঁহার কর্ণে বিষ ঢালিয়া দিত! ঈর্ষার জ্বালায় তাঁহার অন্তর দগ্ধ হইয়া যাইত। তিনি বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, চণ্ডের এ সাধুতা, মুকুলের প্রতি তাঁহার এ বাৎসল্য, শুধু বাহিরের আবরণ; মুকুলকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া নিজে রাণা হইবার হীন ষড়্‌যন্ত্র! যাহাতে কৌশলে কার্যোদ্ধার হয়, চিতোরের সামন্ত ও সর্দারগণ বশীভূত থাকে, তজ্জন্যই শুধু মুকুলের নামে রাজ্য চালনার এই বাহিরের ভড়ং! তাই মুকুলকে এত আদর-যত্ন!

নতুবা রাজপুত রীতি অনুসারে পুত্র নাবালক থাকিলে মাতারই ত' রাজকার্য পরিচালনা করার নিয়ম। মারবার-তনয়া ত' বুদ্ধিহীনা নহেন,

তবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা পর্যন্ত না করিয়া চণ্ডের সে চিরপ্রচলিত ব্যবস্থার ব্যতিক্রম করার আর কি অর্থ হইতে পারে ? মুকুল-জননী এইভাবে চণ্ডের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

যাঁহাকে তিনি গর্ভধারিণী জননীর আসনে বসাইয়া মনে মনে পূজা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহার মুখেই চণ্ডের বিরুদ্ধে এ কি কুৎসিত অভিযোগ ! স্বপ্নেও চণ্ডের মনে কোনদিন যে কল্পনা স্থান পায় নাই, জননী হইয়া তিনি কিনা তাঁহার উপর সে হীন অভিসন্ধিই আরোপ করিতেছেন ! চণ্ডের সরল প্রাণে যেন নিদারুণ শেল বিদ্ধ হইল !

ক্ষোভে-দুঃখে তাঁহার বীর-নয়ন অশ্রু-সিক্ত হইয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন, মহারাণীর মনে যে বিষবৃক্ষের বীজ অঙ্কুরিত হইতেছে, অঙ্কুরেই তাহা বিনষ্ট না করিলে তাহার বিষে সমগ্র মেবার হয়ত একদিন বিষাক্ত হইয়া উঠিবে ! সে বিষে হয়ত সোনার মেবার জ্বলিয়া যাইবে !

স্বদেশের উদ্দেশে কয়েক বিন্দু তপ্ত অশ্রু তর্পণ করিয়া তিনি চিতোর ত্যাগের সঙ্কল্প করিলেন। চিতোরের সর্দারগণ হায়, হায়, করিয়া উঠিলেন। তাঁহার অবর্তমানে চিতোরের ভবিষ্যৎ বিশৃঙ্খলার চিত্র কল্পনা করিয়া তাঁহাদের অন্তর বারংবার শিহরিয়া উঠিল।

চণ্ড তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দানের উদ্দেশ্যে বলিলেন, "আমি চলিলাম। শিশু রাণাকে, চিতোরের স্বাধীনতাকে আপনাদের হাতে রাখিয়া গেলাম। দেখিবেন, রাণার যেন কোন অনিষ্ট না হয়, চিতোরের মর্যাদা যেন অক্ষুণ্ণ থাকে।"

চণ্ডের সহিত তাঁহাদের নয়নও বাষ্পাকুল হইয়া উঠিল।

অবশেষে চণ্ড মুকুল-জননীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে গেলেন। জননীর চরণ বন্দনা করিয়া তিনি অশ্রু-গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিলেন, "মা, মাতৃপদে অভাগা সন্তানের স্থান হইল না, আমি চলিলাম। জানি, তোমার হাতে মুকুলের কোন অযত্ন হইবে না ; তোমা হইতে চিতোরের

কোন অনিষ্ট হইবে না। কিন্তু তবুও আমার মন যেন ভবিষ্যৎ অমঙ্গল আশঙ্কায় অকারণেই কেন শঙ্কাকুল হইয়া উঠিতেছে! হয়ত এ আমার মনোবিকার! ভগবান্ একলিঙ্গের চরণেও এই প্রার্থনা, আমার এ আশঙ্কা যেন অমূলকই হয়! কিন্তু তবুও কোন বিপদের দিনে যদি এ হতভাগ্য সন্তানের কোন প্রয়োজন হয়, আমাকে ডাকিতে সঙ্কোচ করিও না মা! তোমার আহ্বান চিতোরজননীর আহ্বান মনে করিয়া, আমি যেখানে যে অবস্থায়ই থাকি না কেন, ছুটিয়া আসিব। মা, সে বিপদের দিনে তোমার আহ্বানের করুণা হইতে যেন বঞ্চিত না হই!”

আবেগে চণ্ডের বাক্‌রুদ্ধ হইয়া গেল। মুকুল-জননীর নয়নও শুষ্ক রহিল না, কিন্তু তিনি চণ্ডকে বাধাও দিলেন না। রাত্রির অন্ধকারে চণ্ড জন্মভূমি চিতোর হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সেদিন কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি। নক্ষত্র-কুন্তলার ললাটে শুধু সান্ধ্য শুকতারার একটি অনুজ্জ্বল দীপ ক্ষীণ দীপ্তিতে জ্বলিতেছিল। আরাবল্লীর শিখরদেশে দাঁড়াইয়া চণ্ড সেই ক্ষীণ আলোকে আর একবার শত সুখ-স্মৃতি-জড়িত স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি মেবারের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন, হৃদয়হীনা বিমাতার মতই মেবার যেন নিষ্করুণ নেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন!

স্বদেশ হইতে নির্বাসিত চণ্ড ধীরে ধীরে চলিয়াছেন। অবশ্য এই নির্বাসন স্বেচ্ছা-নির্বাসন। নিরানন্দ প্রাণ, অবসন্ন হৃদয়, গতি মন্থর, চরণ অবশ! কোথায় যাইবেন, তাহারও স্থিরতা নাই। তাই দৃষ্টি লক্ষ্যহীন, যাত্রা অনির্দিষ্ট। তবুও অদৃষ্টের পরিহাসে চণ্ডকে আজ অনির্দিষ্ট পথে যাত্রা করিতে গতিহীন চরণে গতি-সঞ্চার করিতে হইল।

শুধু কি জন্মভূমির আকর্ষণ! শিশু মুকুলের আকর্ষণই কি কম! চণ্ড এক এক পদ অগ্রসর হন, আর মনে হয়, মুকুল বুঝি 'দাদাজি' বলিয়া

তাঁহার পিছনে পিছনে আসিতেছে! চলিতে চলিতে কতবার তিনি থমকিয়া দাঁড়াইয়াছেন, শেষে ভুল বুঝিতে পারিয়া আপনার দৌর্বল্যে আপনি লজ্জিত হইয়াছেন।

নিশা অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তিনি মান্দু-রাজ্যের সীমান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন নবীন সূর্য ধরার বুকে নবীন প্রভাত বহন করিয়া আনিতেছিল, তরুণ রবির এই আলোক-সমারোহে নিশার অন্ধকার কাটিয়া আবার সমস্ত জগৎ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, শুধু হতভাগ্য চণ্ডের অন্ধকার হৃদয়েই কোন আলোক-সম্পাত হইল না। তাঁহার বীর আননে বিষাদের একটা ম্লান ছায়া লাগিয়াই রহিল।

মান্দুরাজ তখন অশ্বারোহণে শিকারে যাইতেছিলেন। চণ্ডের বিশাল বপু, বৃষ-স্কন্ধ ও বীর-দীপ্তি তাঁহাকে আকৃষ্ট করিল। তাঁহার পরিচয় পাইয়া মান্দুরাজ তাঁহাকে সসম্মানে স্বরাজ্যে স্থান দান করিলেন।

মান্দুরাজ এ সময় ধীরে ধীরে আপনার রাজ্যবিস্তারে মনোযোগী হইয়াছিলেন। তিনি নিজে বীর, তদুপরি বীর চণ্ডকে সহায়-স্বরূপ পাওয়ায় তাঁহায় সঙ্কল্পের অগ্নিস্ফুলিঙ্গে পবন-সংযোগ হইল। শত্রু-সমরে মান্দুরাজ অজেয় হইয়া উঠিলেন, মান্দু-রাজ্যের পরিধি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

চণ্ডের অপরিসীম বীরত্ব, তাঁহার অমায়িক স্বভাব, বিনয়নম্র ব্যবহার ও উদার হৃদয়ের পরিচয়ে মান্দুরাজ তাঁহার একান্ত অনুরক্ত হইয়া উঠিলেন। সে অনুরাগের পরিচয়-স্বরূপ তিনি চণ্ডকে হল্লার প্রদেশ উপহার প্রদান করিলেন।

চিতোরের যুবরাজ, চিতোরের বীরশ্রেষ্ঠ চণ্ড হল্লার প্রদেশে তাঁহার নির্বাসিত জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু এখানে আসিয়াও একদিনের জন্যও তিনি চিতোরকে ভুলিতে পারিলেন না ; চিতোর তাঁহার দিবসের চিন্তা ও নিশীথের স্বপ্ন হইয়া রহিল!

চার

চণ্ডের চিতোর ত্যাগে মুকুল-জননীর অভিলাষ সিদ্ধ হইল, আনন্দে তাঁহার হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। শিশু রাণার প্রতিনিধি-স্বরূপ মেবারের সর্বেসর্বা হইয়াছেন ভাবিয়া তাঁহার অন্তর গর্বিত হইয়া উঠিল। কিন্তু কয়েকদিন যাইতেই তিনি দেখিলেন, রাজকার্য পরিচালনা করা যত সহজ মনে করিয়াছিলেন, প্রকৃত-প্রস্তাবে তাহা তত সহজ নয়। নানা কূট প্রশ্নের মীমাংসার জন্য দিনরাতই মাথা ঘামাইতে হয়। এতদ্ব্যতীত রাজ্যের সামন্তগণও তাঁহার উপর প্রসন্ন ছিলেন না, শুধু চণ্ডের অনুরোধ স্মরণ করিয়াই তাঁহারা নীরবে আপন আপন কর্তব্য সম্পন্ন করিয়া যাইতেছিলেন। রাণী অন্তর্বিদ্রোহের আশঙ্কা করিয়া পিতা রণমল্লকে সংবাদ প্রদান করিলেন।

মারবার-পতি রণমল্ল এইরূপ একটি সুযোগেরই প্রতীক্ষা করিতে-ছিলেন। কন্যার আহ্বানে পুত্র যোধরাওকে সঙ্গে লইয়া তিনি অবিলম্বে চিতোর-রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। পিতার আগমনে রাণী নিশ্চিন্ত হইয়া বাঁচিলেন।

দৌহিত্র মুকুলকে কোলে লইয়া যেদিন মারবার-পতি রণমল্ল চিতোরের দরবারে আসিয়া বসিলেন, সেদিন লজ্জায় ও ধিক্কারে সামন্তদের হৃদয় যেন মাটির সহিত মিশিয়া যাইতে চাহিল। মহারাজ বাপ্পাদিত্য যে-সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন, বীরেন্দ্র-কেশরী সমরসিংহ যে-সিংহাসনের গৌরব-বৃদ্ধির জন্য জীবন দান করিয়া গিয়াছেন, গিহ্লোট্ বংশের সেই পবিত্র সিংহাসনে কিনা মারবার-অধিপতি রণমল্ল! সামন্ত বীরদের হৃদয় যেন অবরুদ্ধ বাষ্পের মত ফাটিয়া যাইতে চাহিল। কিন্তু তাঁহাদিগকে অন্তরের ক্রোধ অন্তরেই দমন করিয়া রাখিতে হইল।

রণমল্ল পুরাতন বিশ্বাসী সামন্তগণকে অল্পদিনের মধ্যেই অতিষ্ঠ করিয়া তুলিলেন। বার্ধক্যের অজুহাতে অনেক দেশপ্রেমিক সামন্তকে পদচ্যুত করিয়া তিনি তাঁহার আত্মীয়-স্বজনকে সে সকল পদে নিযুক্ত

করিলেন। চিতোরের নির্মল আকাশ অসন্তোষের বিষ-বাষ্পে বিষাক্ত হইয়া উঠিল।

রণমল্লের এই স্বেচ্ছাচারে ক্ষুব্ধ-চিত্ত সামন্তবৃন্দ মুকুল-জননী রাণীর নিকট তাঁহাদের দুঃখের কথা নিবেদন করিতে গেলেন, কিন্তু কোন ফলোদয় হইল না। পিতার হাতে রাজ্যের ভার প্রদান করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত। পিতা যে নূতন ক্ষমতার গর্বে গর্বান্ধ হইয়া কোন অন্যায় করিতে পারেন, কিংবা তাঁহার মনেও যে কোনরূপ দুরভিসন্ধি থাকিতে পারে, মুকুল-জননীর তাহা মনেই হইল না। সামন্ত বীরগণ উষ্ণীষ-প্রান্তে অশ্রু মার্জনা করিয়া চিতোরের ভবিষ্যৎ ভাবিতে ভাবিতে রাণীর নিকট হইতে বিদায় হইলেন।

ইহার কয়েকদিন পর মুকুলের ধাত্রী আসিয়া একদিন চুপে চুপে রাণীকে সংবাদ দিল যে, রণমল্ল মুকুলকে হত্যা করিয়া স্বয়ং চিতোরের সিংহাসন অধিকার করিবার ষড়্‌যন্ত্র করিতেছেন। ধাত্রী স্বকর্ণে তাহা শুনিয়া আসিয়াছে।

সামন্ত বীরদের কথাই যিনি বিশ্বাস করেন নাই, সাধারণ ধাত্রীর কথায় তাঁহার বিশ্বাস হইবে কেন? রাণী ধাত্রীকে কঠোর তিরস্কার করিয়া সাবধান করিয়া দিলেন। বলিয়া দিলেন, ইহার পরে কোনদিন যদি তাহার মুখে তাঁহার হিতৈষী পিতার বিরুদ্ধে এমন কোন অমূলক বিদ্বেষ-অভিযোগ শ্রবণ করেন, তবে চিতোরের রাজ-অন্তঃপুর হইতে তাহাকে চিরদিনের জন্য নির্বাসিত হইতে হইবে।

ধাত্রী আর কি করিবে! মুকুলকে সে আপন সন্তানের মতই ভালবাসিত—চিতোর-রাজ্যের মঙ্গল তাহার নিকট প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় ছিল। তাই দেবাদিদেব একলিঙ্গের চরণ স্মরণ করিয়া মনে মনে বলিল, "শিশোদীয় বংশের শিশু রাণার প্রাণ রক্ষা করিও প্রভু! চিতোরের যেন সর্বনাশ না হয়!"

কিন্তু রাণীর চক্ষু ফুটিতে বেশী বিলম্ব হইল না। অচিরেই তিনি পিতার স্বরূপের পরিচয় পাইলেন। স্নেহের আবরণে রণমল্ল যে কী

—তবে···তাহাকে চিরদিনের জন্য নির্বাসিত হইতে হইবে।

তীব্র কালকূট অন্তরে পোষণ করিতেছেন, তাহা স্মরণ করিতেই আতঙ্কে তাঁহার হৃদয় অবশ হইয়া আসিল।

চণ্ডের মধ্যম সহোদর রঘুদেব সাংসারিক সুখভোগ বিসর্জন দিয়া কৈলবারা প্রদেশে সন্ন্যাসি-জীবন যাপন করিতেছিলেন। রাজ্যের সমুদয় কোলাহল হইতে দূরে তাঁহার নির্জন আশ্রমে বসিয়া তিনি উপাসনা-আরাধনায় দিনাতিপাত করিতেন।

রঘুদেব প্রিয়দর্শী, প্রিয়ভাষী। শৌর্যবীর্যে যুবরাজ চণ্ডের উপযুক্ত ভ্রাতা। তদুপরি তিনি পরোপকারী সন্ন্যাসী, রাজপুত্র হইয়াও আশ্রমবাসী। তাই মেবারের আবালবৃদ্ধবনিতা রঘুদেবকে দেবতার মত ভক্তি করিত; তাঁহার মুখের কথা শুনিবার জন্য, তাঁহার একটু আশীর্বাদ লাভের আশায় মেবারের নরনারী ব্যাকুল হইয়া উঠিত।

মেবারবাসীর উপর রঘুদেবের এতখানি প্রভাব-প্রতিপত্তি ক্রূর-স্বভাব রণমল্লের অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন, রাজপুত্র হইয়াও যিনি সংসার-বীতরাগী, তিনি নিশ্চয়ই ভণ্ড, তাঁহার এই সন্ন্যাস শুধু লোকের চক্ষে ধূলা দিবার ভণ্ডামি!

দুরাচার রণমল্ল ভুলিয়া গেলেন, এই ভারতেরই এক রাজপুত্র রাজত্ব-সুখে জলাঞ্জলি দিয়া একদিন সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন, কঠোর তপস্যায় বুদ্ধ হইয়া জগতে অহিংসার বাণী প্রচার করিয়াছিলেন! বুদ্ধের মত রঘুদেবের সন্ন্যাসেও যে কোন প্রকার কপটতা ছিল না,—ভোগ-প্রমত্ত, পররাজ্য-লোভী, কূট-কৌশলী রণমল্লের তাহা বুঝিবার মত হৃদয়ের উদারতা কোথায়? তাই তিনি এই শান্ত সন্ন্যাসীর প্রাণ-সংহারের চিন্তা করিতে লাগিলেন।

প্রকাশ্যে হত্যা করিলে চিতোরবাসী যে তাঁহাকে ক্ষমা করিবে না, সে সম্বন্ধে তাঁহার বিলক্ষণ ভয় ছিল। তাই তিনি কৌশলে দুরভিসন্ধি-সিদ্ধির আয়োজন করিলেন। তিনি গোপনে একটি বিষাক্ত পোশাক নির্মাণ করাইয়া রাণার নামে তাহা রঘুদেবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

রাণা বা রাজপরিবারের কেহ কোন পরিচ্ছদ প্রেরণ করিলে রাজপুত-

-গণ তাহা অত্যন্ত সম্মান-সূচক বলিয়া মনে করেন এবং দাতার সম্মান রক্ষার জন্য তাহা অবিলম্বে পরিধান করিয়া থাকেন। সেই প্রচলিত বিধি অনুযায়ী রঘুদেব যেই রণমল্ল-প্রেরিত পোশাকটি পরিধান করিলেন, তৎক্ষণাৎ প্রবল বিষের ক্রিয়ায় তিনি অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। এ জীবনে আর তাঁহার চৈতন্য-সঞ্চার হইল না। যে রাজ্যে প্রতারণা নাই, ষড়যন্ত্র নাই, শান্ত সাধক সেই চির-সুন্দরের দেশে চলিয়া গেলেন! সমগ্র মেবার-রাজ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল!

রণমল্লের এই দুষ্কর্মের কথা বেশীদিন গোপন রহিল না। অচিরেই মেবারবাসী সকলেই জানিতে পারিল, মারবার-পতিই তাহাদের প্রিয় রঘুদেবজীর মৃত্যুর কারণ। তাঁহার চক্রান্তেই এই পরহিতকামী সন্ন্যাসী রাজপুত্রের মৃত্যু হইয়াছে।

ক্রমে এ কথা মুকুল-জননীর কর্ণেও প্রবেশ করিল। অন্যান্য চিতোরবাসীর মত তিনিও রঘুদেবের একজন ভক্ত ছিলেন। এই সৌম্যদর্শন, শান্তশ্রী সন্ন্যাসী সন্তানটিকে তিনি আপন সন্তানের মতই ভালবাসিতেন। তাই তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ ও পিতার চক্রান্তের কথা শ্রবণ করা মাত্র তিনি শিহরিয়া উঠিলেন।

সেদিন ধাত্রীর যে-কথা তিনি অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন, আজ আর তাহার সত্যতা সম্বন্ধে তাঁহার কোন সন্দেহ রহিল না। শিশু মুকুলের প্রাণরক্ষার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার ভীতি-বিহ্বল নয়ন-সম্মুখে তিনি দেখিতে পাইলেন, তাঁহার ক্রূরমতি পিতার উদ্যত অসি তাঁহার প্রাণপ্রিয় মুকুলের মস্তকের উপর উদ্যত হইয়া রহিয়াছে! তাহা যে-কোন মুহূর্তে শিশু মুকুলকে—চিতোরের ভবিষ্যৎ রাণাকে সংহার করিতে পারে।

আজ এই দুঃসময়ে তাঁহার মনে হইল, নিরপরাধ বীর, দেশভক্ত, মাতৃভক্ত চণ্ডকে চিতোর হইতে নির্বাসিত করিয়া তিনি কি বিষম ভুলই

করিয়াছেন! তাঁহার চরণে বিদায় গ্রহণের সময় চণ্ড যে কথা বলিয়া গিয়াছিলেন, এত অল্প সময়ের মধ্যেই তাহা এমন মর্মান্তিকভাবে সত্য হইয়া উঠিবে, তিনি ত' তাহা কল্পনাও করিতে পারেন নাই!

ব্যাকুল রাণী ধাত্রীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। অশ্রু-গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিলেন, "আমার মুকুলকে বাঁচাও ধাত্রী! পিতার ক্রূর-অভিসন্ধি হইতে তোমাদের চিতোর-রাণার প্রাণরক্ষা কর—মুকুলকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও!"

ধাত্রী তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "এত অধীর হইলে সমস্ত পণ্ড হইবে, মা! ধৈর্য ধর। চণ্ডকে সংবাদ দিবার ব্যবস্থা কর। এ বিপদ হইতে একমাত্র চণ্ডই সকলকে রক্ষা করিতে পারিবেন।"

রাণী ব্যাকুল আগ্রহে বলিলেন, "চণ্ড! সে কি আসিবে ধাত্রী? আমারই উপর অভিমান ভরে যে স্বেচ্ছায় চিতোর ত্যাগ করিয়াছে, আমি একবার বাধাও দেই নাই,—সেই চণ্ড আমার এ বিপদের সময় আসিবে কি!"

ধাত্রীর মুখ এই বিপদের সময়েও হাসির আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। দৃপ্ত কণ্ঠে ধাত্রী বলিল, "চণ্ডকে তুমি চিন নাই রাণী! মেবারের অধিবাসীর হৃদয়ের পরিচয় এখনও পাও নাই! চণ্ডের উপর যত অন্যায়ই করা হইয়া থাকে, চিতোরের এ বিপদের কথা শ্রবণ করিলে তিনি একমুহূর্তও বিলম্ব করিবেন না! ভাইকে রক্ষা করিবার জন্য, রাণার জীবন নিরাপদ করিবার জন্য, চিতোরকে এ বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তিনি ছুটিয়া আসিবেন, রাণী! চিতোরের আহ্বান!—সে আহ্বান উপেক্ষা করিবেন যুবরাজ চণ্ড!"

তখনই একজন বিশ্বস্ত দূত মান্দুরাজ্যে চণ্ডের নিকট প্রেরিত হইল।

পাঁচ

অপরাহ্নের ক্লান্ত সূর্য তখন দিগন্তের গায় ঢলিয়া পড়িতেছিল, চণ্ড সেই অস্ত-রবির রক্ত-রশ্মির দিকে চাহিয়া চাহিয়া চিতোরের কথাই ভাবিতেছিলেন।

চিতোর!—তাঁহার জন্মভূমি, তাঁহার শৈশবের ক্রীড়াক্ষেত্র, তাঁহার প্রথম যৌবনের কর্মভূমি চিতোর! যে চিতোরের আকাশ তাঁহাকে দিয়াছে আনন্দ, বাতাস দিয়াছে প্রাণ, যে চিতোরের জল-শস্য তাঁহাকে দিয়াছে জীবনী-শক্তি, তরুলতা দিয়াছে নয়নের তৃপ্তি,—আজ তিনি সেই চিতোর হইতে নির্বাসিত! পররাজ্যে প্রবাসীর জীবন!—এ দুঃখ রাখিবার ঠাঁই কোথায়?

চণ্ড আপন চিন্তায় আপনি তন্ময়, এমন সময় চিতোরের দূত আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন জ্ঞাপন করিল। চণ্ড তাহার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিতেই দূত মহারাণীর চিঠিখানি তাঁহার হাতে তুলিয়া দিল।

চিতোরের মহারাণীর চিঠি! পরম শ্রদ্ধাভরে প্রথমে মাথায় ঠেকাইয়া চণ্ড অধীর চিত্তে তাহা খুলিয়া ফেলিলেন। রাণী চিতোর ও চিতোরের শিশু-রাণার বিপদের কথা জানাইয়া চণ্ডের সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছেন, বিমাতার উপর অভিমান ভুলিয়া আবার চিতোরে প্রত্যাবর্তন করিতে তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছেন!

চণ্ড দূতের মুখে একে একে চিতোরের সমুদয় সংবাদই শ্রবণ করিলেন। বুঝিলেন, মুকুল আজ রণমল্লের তীক্ষ্ণ-দৃষ্টির দুর্ভেদ্য কারাগারে বন্দী। এ সময় চারিদিক বিবেচনা করিয়া কাজ না করিলে মুকুলের প্রাণরক্ষার কোন আশা নাই! মুকুল—তাঁহার কচি ভাইটি! তাহাকে যে-কোন মূল্যে রক্ষা করিতেই হইবে!

তিনি দূতের নিকট বলিয়া দিলেন, "দেওয়ালীর মহোৎসব নিকট-বর্তী। দেওয়ালীর দিন মুকুল যেন উৎসব-দর্শন উপলক্ষে গোসুন্দ নগরের দেবী-মন্দিরে উপস্থিত থাকেন। আর দেওয়ালী পর্যন্ত এই কয়টি দিন

রাণীমা যেন মুকুলকে খুব সতর্কভাবে রাখেন। এই কয়েকটি কথা স্মরণ রাখিয়া তদনুযায়ী কাজ করিলেই মুকুল সকল বিপদ হইতে মুক্ত হইবে!”

চণ্ডের নিকট হইতে দূত পাঠাইয়াও মুকুল-জননী নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছিলেন না! দূত নির্বিঘ্নে চণ্ডের নিকট পৌঁছিতে পারিল কি না, পৌঁছিয়া থাকিলেও চণ্ড আসিবেন কি না, তাহা না জানা পর্যন্ত কিছুতেই তিনি তাঁহার উদ্বেগ দূর করিতে পারিতেছিলেন না।

অবশেষে দূত আসিয়া চণ্ডের সংবাদ জ্ঞাপন করিল। চণ্ড নিজে আসিলেন না, শুধু এই কথা কয়টি বলিয়া পাঠাইয়াছেন। রাণী হতাশ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সমস্ত আশা-ভরসা বিলুপ্ত হইয়া গেল।

ধাত্রী রাণীমাকে পুনরায় প্রবোধ দিতে লাগিল। বলিল, “চণ্ড যখন অভয় দিয়াছেন, তখন দেওয়ালীর দিন মুকুল গোস্থন্দ-নগরে উপস্থিত থাকিলে তাঁহার যে আর কোন ভয় নাই, তাহা নিঃসন্দেহ। চণ্ড যাহা বলিয়াছেন, দশদিক ভাবিয়া মুকুলের মঙ্গলের জন্যই বলিয়াছেন। কাজেই এখন এমন অধীর হইলে সমস্ত দিকই পণ্ড হইয়া যাইবে।”

এ কথায় কি আর রাণীর মন প্রবোধ মানে! যাহা হৌক্, অতি কষ্টে হৃদয় সংযত করিয়া তিনি দেওয়ালীর জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

অবশেষে দেওয়ালীর মহোৎসব-দিবস উপস্থিত হইল। জননীর চরণধূলি গ্রহণ করিয়া মুকুল গোস্থন্দ-নগরে গমন করিলেন। সমস্ত দিন কাটিয়া গেল, কৃষ্ণ-বসনা সন্ধ্যা তাহার কৃষ্ণাঞ্চল-ছায়ায় সমস্ত জগৎ ঢাকিয়া ফেলিল। ক্রমে কৃষ্ণা-চতুর্দশীর ঘন তমসায় সমস্ত আরাবল্লী পর্বত বিভীষিকাময় হইয়া উঠিল। কিন্তু চণ্ডের দেখা নাই! নৈরাশ্যে, চিন্তায়, আতঙ্কে মুকুলের প্রাণ বারবার কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল!

অবশেষে হতাশ-হৃদয়ে তিনি চিতোর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। রজনীর ঘোর তমসার সহিত পর্বতশ্রেণীর ঘোরতর কৃষ্ণ ছায়ায় পথের বিভীষিকা যেন সহস্রগুণ বৃদ্ধি পাইতেছিল।

কিছুদূর অগ্রসর হইতেই মুকুল পশ্চাতে অশ্বের পদশব্দ শুনিতে পাইলেন। তাঁহার ভয়ার্ত হৃদয় চমকিত হইয়া উঠিল। ভাবিলেন, আর বুঝি তাঁহার রক্ষা নাই! তাঁহার শিথিল হস্ত হইতে অশ্বের বল্গা খসিয়া পড়িল! কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। গোপন সঙ্কেত হইতে তিনি বুঝিলেন, পশ্চাতে অশ্বারোহী দল চণ্ড ও তাঁহার অনুচর!

অশ্বারোহিগণ নগরীর তোরণদ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র দ্বারপাল তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। চণ্ড বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন, "আমরা গোস্থন্দ-নগরের নিকটেই বাস করি। দেওয়ালীর উৎসবে আসিয়াছিলাম। রাত্রি হওয়ায় আমাদের রাণাকে প্রাসাদে পৌঁছাইয়া দিতে আসিয়াছি!"

দ্বাররক্ষীরা কোনরূপ সন্দেহ করিল না। কিন্তু চল্লিশজন বিশ্বাসী অনুচরসহ চণ্ড দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়াই বীরমূর্তি ধারণ করিলেন। তাঁহার প্রচণ্ড বিক্রমে চিতোর-দুর্গ কম্পিত হইয়া উঠিল, তাঁহার তীক্ষ্ণধার অসির আঘাতে রণমল্লের পক্ষের রাঠোর সৈন্যগণ মুণ্ডচ্যুত হইয়া ভূমিতে গড়াগড়ি যাইতে লাগিল। নিমেষের মধ্যে সমগ্র চিতোর-দুর্গ চণ্ডের অধিকৃত হইল, মুকুল-রাণার জয়গানে চিতোরদুর্গ মুহুর্মুহুঃ কম্পিত হইতে লাগিল।

চণ্ড উন্মুক্ত কৃপাণ-হস্তে উন্মত্তের মত রণমল্লের সন্ধানে কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহার সন্ধান মিলিল। তিনি দেখিলেন, অত্যধিক সুরাপানে অচৈতন্য রণমল্ল পালঙ্কের নীচে লুটাইতেছেন। চণ্ড তাঁহার নিকট অগ্রসর হইবার পূর্বেই তাঁহার এক অনুচরের অসির আঘাতে পাপিষ্ঠ রণমল্লের পাপ-জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিল। দুরাচার রাজার দুরাশা চিরদিনের জন্য নিবৃত্ত হইল!

এদিকে মুকুল-জননী মুকুলকে গোস্থন্দ-নগরে পাঠাইয়া উৎকণ্ঠায় কালক্ষেপ করিতেছেন, এমন সময় চিতোর-দুর্গ অকস্মাৎ প্রচণ্ড চীৎকার

ও যুদ্ধমান সৈনিকদের অস্ত্রের ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে চমকিত হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে রাণীর হৃদয়ও মুকুলের অমঙ্গল আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল।

যাহা হৌক, সে ভীতি-বিহ্বলতা দূর হইতে বিলম্ব হইল না। সত্বরই রাণা মুকুলের জয়ধ্বনি আসিয়া রাণীর কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি বুঝিলেন, চণ্ড আসিয়াছেন! এবার আর ভয় নাই।

সত্যই আর ভয় ছিল না। চণ্ড মুকুলের হাত ধরিয়া রাণীর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাণী আর সে রাণী ছিলেন না। মুকুলের বিপদের অগ্নিতে তাঁহার মনের সমস্ত ময়লা পুড়িয়া নির্মল হইয়া গিয়াছিল। তিনি একহাতে মুকুলকে কোলে টানিয়া লইলেন, আর একখানি হাত ধীরে ধীরে চণ্ডের মাথার উপর রাখিলেন। তাঁহার স্নেহের উৎস হইতে বীর পুত্রের উপর নীরব আশীর্বাদ বর্ষিত হইতে লাগিল ঃ

মুকুল তাঁহার অগ্রজের বলিষ্ঠ বাহুর আশ্রয়ে নিরাপদ হইলেন, চণ্ড তাঁহার হারানো মাতৃস্নেহ পুনরায় ফিরিয়া পাইলেন। চিতোর জুড়িয়া আবার জয়ধ্বনি উঠিল।

ছয়

রণমল্লের পুত্র যোধরাও তখন দুর্গের বাহিরে ছিলেন। পিতার নিধন-সংবাদ এবং চণ্ড-কর্তৃক চিতোর-দুর্গ অধিকারের সংবাদ শ্রবণ করিবামাত্র তিনি প্রাণভয়ে ভীত হইয়া অশ্বারোহণে মুন্দর-অভিমুখে পলায়ন করিলেন। চণ্ডও তাঁহাকে ধরিবার জন্য তাঁহার অনুসরণ করিয়া মুন্দরে উপস্থিত হইলেন। নিরুপায় যোধরাও তখন মুন্দর ত্যাগ করিয়া ছদ্মবেশে আত্মগোপন করিলেন। বিনা রক্তপাতে মুন্দর চণ্ডের অধিকৃত হইল। চণ্ডের পুত্র কণ্ঠ ও মুঞ্জ মুন্দর শাসন করিতে লাগিলেন।

লুনী নদীর পরপারে হরবা শঙ্কল নামে এক সন্ন্যাসীর আশ্রম ছিল। গৈরিক-পরিহিত হইলেও তাঁহার বীরত্ব ছিল অপরিসীম,

রাজস্থানের সকলে তাঁহাকে যেমন সম্মান করিত, তেমনই ভয়ও করিত। বিপন্নকে আশ্রয়দান ও তাহার বিপদ মোচন, ইহাই ছিল শঙ্কলের

তিনি এক হাতে মুকুলকে… চণ্ডের মাথার উপর রাখিলেন।

জীবন-ব্রত। পরম শত্রুও তাঁহার আশ্রয় ভিক্ষা করিলে আপন শোণিত দানে তিনি তাহাকে রক্ষা করিতেন। গুরুর আদর্শে অনুপ্রাণিত

হইয়া তাঁহার বীর শিষ্যগণও শরণাগতকে রক্ষা করিবার জন্য জীবন পণ করিতেন।

চণ্ডের ভয়ে যোধরাও আসিয়া হরবা শঙ্কলের আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন। তখন রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর। সন্ন্যাসী অতিথি-সৎকার কার্য শেষে সবেমাত্র নিদ্রার আয়োজন করিতেছেন, এমন সময় শতাধিক অনুচরসহ যোধরাও তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হইলেন।

এতগুলি অতিথির আহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে, অথচ আশ্রমে একমুষ্টি অন্ন নাই, এত রাত্রিতে কোন স্থান হইতে আহার্য সংগ্রহ করাও সহজসাধ্য নহে। কি করা যায়, সন্ন্যাসী তাহা ভাবিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ স্মরণ হইল, বস্ত্রাদি রঞ্জিত করিরার জন্য গৃহকোণে একবোঝা মুঞ্জকাষ্ঠ সংগৃহীত রহিয়াছে। কিঞ্চিৎ মিষ্টি ও গোধূম-চূর্ণ সহকারে মুঞ্জকাষ্ঠ সিদ্ধ করিয়া সন্ন্যাসী এক উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা অতিথি-সৎকার করিলেন।

যোধরাও ও তাঁহার অনুচরগণ পরদিন নিদ্রাভঙ্গে সবিস্ময়ে দেখেন, তাঁহাদের সকলের ওষ্ঠাধরই বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত! মুঞ্জকাষ্ঠের ব্যঞ্জন ভক্ষণের ফলেই যে এইরূপ হইয়াছে, হরবা শঙ্কল ব্যতীত সেকথা ত' আর কেহ জানিতেন না, তাই তাঁহারা সবিস্ময়ে পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন।

হরবা শঙ্কলও প্রকৃত কথা গোপন করিয়া শুধু বলিলেন, "প্রভাত-সূর্যের রক্তলেখার মত আপনাদের অধরোষ্ঠ যেমন রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে, ভগবানের আশীর্বাদে আপনাদের ভাগ্যও অচিরেই তেমনই প্রসন্ন হইয়া উঠিবে। আপনারা পুনরায় মুন্দর-রাজ্য ফিরিয়া পাইবেন।"

সন্ন্যাসীর আশীর্বাদে যোধরাওএর অন্তর পুনরায় আশার আশ্বাসে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। গত রজনীতে আতিথ্য-সৎকারের ত্রুটি হইয়াছিল

বলিয়া সন্ন্যাসীর অনুরোধে সেদিনও তিনি সেই আশ্রমেই থাকিয়া গেলেন।

সন্ন্যাসীর সহায়তায় শক্তিমান্ হইয়া অবশেষে যোধরাও একদিন সসৈন্যে মুন্দরে উপস্থিত হইলেন। কণ্ঠ বা মুঞ্জ কেহই এই অতর্কিত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁহারা রণসজ্জায় সজ্জিত হইবার পূর্বেই যোধরাওএর সৈন্যদের উন্মুক্ত অসি ঝন্ঝন্ করিয়া উঠিল। কণ্ঠ সে অসির আঘাতেই প্রাণ হারাইলেন।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এই শোচনীয় পতন দেখিয়া মুঞ্জ প্রাণভয়ে পলায়ন করিলেন, কিন্তু তাহাতেও তিনি পরিত্রাণ পাইলেন না। যোধরাওয়ের সৈন্যগণ তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। অবশেষে তাহাদেরই একজনের নিক্ষিপ্ত শরাঘাতে গদবার রাজ্য-সীমায় মুঞ্জের প্রাণহীন দেহ অশ্ব হইতে ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল।

এইভাবে কণ্ঠ ও মুঞ্জের প্রাণসংহার করিয়া যোধরাও পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু চণ্ডের ভয়ে তিনি সন্ত্রস্ত হইয়া রহিলেন। মুন্দর অধিকারচ্যুত হইল, চণ্ডের উভয় পুত্রই নিহত হইল— কাজেই বীরবর চণ্ড যে ইহার উপযুক্ত প্রতিশোধ লইতে কালবিলম্ব করিবেন না, যোধরাও-এর ইহাতে কোন সংশয় রহিল না। তিনি চণ্ডের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন।

পরম শত্রুও ক্ষমা প্রার্থনা করিলে তাহাকে ক্ষমা প্রদর্শন করা রাজপুতের বীরধর্ম। চণ্ডও পুত্রশোক ভুলিয়া তৎক্ষণাৎ যোধরাওকে ক্ষমা করিলেন।

মেবারের সহিত মারবার সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইল। সন্ধির শর্ত রহিল যে, যোধরাও জীবনে কোনদিন মেবারের প্রতিকূলাচরণ করিবেন না। এতদ্ব্যতীত যে স্থানে মুঞ্জের মৃত্যু হইয়াছে, ভবিষ্যতে সেই স্থানই মেবারের রাজ্য-সীমা বলিয়া নির্দিষ্ট হইবে।

* * * *

মুকুলের সিংহাসন তখন নিরাপদ হইয়াছে! চণ্ডের সাহায্যের আর তেমন প্রয়োজন ছিল না। এতদ্ব্যতীত পুত্রদ্বয়ের মৃত্যুশোকে সংসারের উপরও চণ্ডের অনুরাগ কমিয়া আসিয়াছিল। তিনি চিতোর ত্যাগ করিয়া রাজর্ষি হরবা শঙ্কলের আশ্রমে যোগদান করিলেন।

শত্রুমিত্র-নির্বিশেষে বিপন্নের বিপদুদ্ধারই তাঁহার শেষ-জীবনের ব্রত হইয়া উঠিল।

* * * *

মেবার কাহিনী লিখিতে বসিয়া মারবারের কথাও কিছু আসিয়া যায়।

মেবারের সমকক্ষ না হইলেও মারবারও ছিল শক্তিশালী রাজপুত রাজ্য। দুই রাজ্যের মধ্যে একদিকে যেমন শত্রুতারও শেষ ছিল না, অন্যদিকে দুই রাজ-পরিবারের মধ্যে আত্মীয়তা স্থাপনেও বিলম্ব হইত না।

মেবারের সহিত মারবারের সন্ধি স্থাপিত হইবার কিছুকাল পর যোধরাও মারবারের রাজধানী যোদাগির বা যুদ্ধগিরি নামক স্থানে প্রতিষ্ঠা করিলেন।

প্রাচীন রোমানদের মত প্রাচীন রাজপুতগণও বিশেষ কোন শুভ লক্ষণ না দেখিলে, অথবা শুভ ইঙ্গিত লাভ না করিলে যুদ্ধযাত্রা, রাজকার্যে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ইত্যাদি গ্রহণ করিতেন না। অন্ততপক্ষে রাজকুলগুরু বা লোকপূজ্য যোগীদের নির্দেশ তাঁহারা সর্বদাই মানিয়া চলিতেন। অতএব মুন্দর হইতে যোদাগিরে রাজধানী স্থাপনের পশ্চাতে যোধরাও নিশ্চিতই এইরূপ কোন ইঙ্গিত বা গুরুর নির্দেশ লাভ করিয়াছিলেন।

যোদাগিরের স্থানীয় আদিবাসিগণ জায়গাটিকে বলে বাকুর-চিড়িয়া, অর্থাৎ পাখির বাসা। মুন্দরের মতই সম-উচ্চতার এক পাহাড়। সেই

পাহাড়ের মাথায় পাখির বাসার মতই বেশ খানিকটা পাথর-ঘেরা স্থান। তাই বাকুর-চিড়িয়া নাম।

জনশ্রুতি যে, বাকুর-চিড়িয়ায় এক যোগী বাস করিতেন। নিজ সাধনার বলে তিনি সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন। বাকুর-চিড়িয়ার এই যোগীর নির্দেশেই যোধরাও মুন্দর হইতে যোদাগিরে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন।

নিঃসন্দেহে যোগীর নির্দেশ ছিল অত্যন্ত মূল্যবান। কারণ রাজোয়ারার মাটিতে তখন যুদ্ধ ও সংঘাত ছিল নিত্যকার ঘটনা। শত্রু ও প্রতিপক্ষের আঘাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রত্যেক রাজপুত রাজা ও সর্দারই নিরাপদ স্থানে দুর্গ নির্মাণ করিতেন। ঘন জঙ্গল ও দুর্ভেদ্য পাহাড়ে ঘেরা যোদাগিরি ছিল এইরূপ একটি নিরাপদ জায়গা।

এইখানে যোধরাও নতুন রাজধানী স্থাপন করিয়া দুর্গ নির্মাণ করিলেন। যোধরাওয়ের এই রাজধানীই বর্তমান যোধপুর।

রাজ্যের নিরাপত্তা ও সামরিক কারণে যোধরাও মুন্দর হইতে যোদাগিরে রাজধানী স্থানান্তর করিলেও মারবারের রাঠোর রাজবংশ পিতৃপুরুষের স্মৃতি-বিজড়িত মুন্দরকে কখনও ভুলিতে পারে নাই।

একষট্টি বৎসর বয়সে যোধরাওয়ের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রগণ পিতার চিতাভস্ম প্রাচীন মুন্দর প্রাসাদে সংরক্ষিত করেন।

যোধরাওয়ের পুত্রের সংখ্যা ছিল চৌদ্দ! তাঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র সান্তল, দ্বিতীয় পুত্র সূরয, চতুর্থ পুত্র দুধো এবং ষষ্ঠ পুত্র বিকুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

জ্যেষ্ঠ পুত্র সান্তল পাঠানদের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হইয়াছিলেন। তিনি সান্তলমীর নামে দুর্গ নির্মাণ করেন।

বিকু ছিলেন বিকানীর শহরের প্রতিষ্ঠাতা।

যোধরাওয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সূরয সিংহাসনে আরোহণ করেন।

রাজপুত রক্তের গৌরব ও শৌর্য লইয়াই সূরয জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পাঠানদের হাতে নিগৃহীত রাজপুত কুমারীদের সম্ভ্রম রক্ষার জন্য সূরয নিজ প্রাণ বিসর্জন দেন।

ঘটনাটি একটু বিশদ করিয়া বলা দরকার।

সেদিন তীজ পরব। পরব উপলক্ষ করিয়া পীপর শহরে মেলা বসিয়াছে।

তীজ রাজপুতদের খুব বড় উৎসব। শ্রাবণ মাসের তৃতীয়ায় এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তাই তীজ নাম।

তীজের সময় সমগ্র রাজস্থান উৎসবমুখর হইয়া উঠে। কথিত আছে, এই দিনে দীর্ঘ তপস্যার পর পার্বতী শিবের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।

তীজের দিন সকল শ্রেণীর রাজপুত নরনারী লাল রঙের পোশাক পরিধান করে। মেয়েরা লাল রঙের ঘাঘরা, ওড়না পরিধান করিয়া, মাথায় পিতলের কলস লইয়া শোভাযাত্রা বাহির করে। মেয়েদের 'সহেলিয়া' বা আনন্দের গানে রাজোয়ারার নগর-পল্লী-মাঠ-প্রান্তর মুখরিত হইয়া উঠে। পরিবারের কর্তা ছেলে-মেয়েদের লাল রঙের পোশাক উপহার দেন। সেদিন জয়পুরের রাজা সামন্ত সর্দারদের মধ্যে লাল রঙের কুরতা, পাগড়ি ইত্যাদি বিতরণ করেন।

তীজের দিনে রাজপুতরা নতুন জমির পত্তন নেয়। সেদিন প্রবাসী রাজপুতদের ঘরে ফেরারও দিন। দূর-দূরান্তে কর্মরত রাজপুত সৈনিক ব্যবসায়ীরা তীজ পরবের সময় 'বাপোটা' বা পিতৃভূমিতে ফিরিয়া আসে।

এমনি এক তীজ পরবের দিনে পীপর শহরে রাজপুত কুমারী মেয়েরা লাল ঘাঘরা, লাল ওড়না পরিয়া উৎসবে মাতিয়া উঠিয়াছে। ক্বচিৎ

বিদ্যুৎশিখার আলোকে তাহাদের পোশাক ঝলমল করিয়া উঠিতেছে। শ্রাবণধারার সঙ্গীতের সঙ্গে কুমারী মেয়েদের সহেলিয়া গান মিশিয়া গিয়াছে। চারিদিকেই উৎসবের রেশ, চারিদিকেই আনন্দের ফোয়ারা। সন্ধ্যা আর একটু ঘোর হইলেই, মন্দিরে যখন আরতির ঘণ্টা বাজিয়া উঠিবে, তখন মেয়েরা মন্দিরে গিয়া পার্বতীর আরাধনা করিবে। আজিকার শুভ দিনে দেবী পার্বতীর নিকট যাহাই প্রার্থনা করা হয়, দেবী প্রসন্ন চিত্তে সেই প্রার্থনা পূর্ণ করেন।

এমন সময় কাছে কোথাও বজ্রপাত হইল। আকাশ ভাঙিয়া প্রবল বর্ষণ নামিয়া আসিল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে এক দল পাঠান সৈনিক ছোট প্রজাপতির ঝাঁকের মতন সুন্দর সেই ছোট ছোট রঙিন মেয়েদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহাদের চুরি করিয়া লইয়া গেল। পাঠানদের কঠিন বর্বর হাত এক মুহূর্তে যেন একটি কোমল স্পর্শকাতর ফুলের বাগান দলিত মথিত করিয়া ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়া গেল।

দরবার শেষ হইয়া গিয়াছে। অধিকাংশ সামন্ত সর্দারই দরবার ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। অল্প কয়েকজন সর্দার নিজ নিজ ব্যক্তিগত প্রয়োজনের কথা রাজা সূরযের নিকট বলিতেছেন। তাহাদের কথা শেষ হইলেই সূরয অন্তঃপুরে বিশ্রামের জন্য চলিয়া যাইবেন। এমন সময় পীপড় হইতে দ্রুত অশ্বপৃষ্ঠে রাজকর্মচারী দরবারে ছুটিয়া আসিয়া রাজা সূরযকে পাঠানগণ কর্তৃক একশত চল্লিশজন রাজপুত কুমারী অপহরণের সংবাদ নিবেদন করিল।

সংবাদটি সূরযের রাজপুত রক্তে আগুন জ্বালিয়া দিল। তিনি তৎক্ষণাৎ উপস্থিত অল্প কয়েকজন সর্দার এবং কিছু সৈনিক সঙ্গে লইয়া পাঠানরা যে পথ দিয়া পলায়ন করিয়াছিল, সেই পথে অশ্বপৃষ্ঠে অগ্রসর হইলেন।

সারা রাত্রি তাঁহাদের অশ্বপৃষ্ঠে কাটিল। অবশেষে মরুভূমির

আকাশে সূর্যোদয় হইল। ভোরের আলোয় আদিগন্ত স্পষ্ট মরুর বালি প্রান্তরের শেষে রাজপুত অশ্বারোহীদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পলায়নপর পাঠান-দের দল দেখা দিল।

রাজা সূরয এবং তাঁহার সঙ্গীসাথীরা অশ্বের গতি দ্রুত করিয়া পাঠানদের ধরিয়া ফেলিলেন।

দুই দলে তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গেল। সূর্যের আলোয় রাজপুতদের অসি ঝলকাইতে লাগিল। সূর্যস্নাত মরুভূমির শুভ্র বালি পাঠানদের রক্তে কলঙ্কিত হইল। রাজপুত কুমারী সকলকেই মুক্ত করা গেল।

যুদ্ধ জয় করিয়া রাজপুত বীরগণ কুমারী কন্যাদের সঙ্গে লইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলেন।

শুধু একজন ফেরেন নাই। তিনি রাঠোর-বীর মারবারের রাজা সূরয।

একাকী বহু পাঠান সৈনিকের অস্ত্রের মোকাবিলা করিতে গিয়া তিনি চিরকালের মত মরুশয্যায় রাঠোর রাজপুত রক্তের গরিমা ও শৌর্য অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন।

যোধরাওয়ের চতুর্থ পুত্র দুধো মেবারের সঙ্গে মারবারের বন্ধন দৃঢ় করার চেষ্টা করেন। বিখ্যাত সাধিকা মীরাবাঈ ছিলেন দুধোর কন্যা।

দুধো মেবারের রানা কুম্ভের সঙ্গে মীরার বিবাহ দেন। এই বিবাহ অবশ্য সুখের হয় নাই।

কুম্ভ মীরাকে সুখী করিতে চাহেন। মীরারও পতিভক্তির অভাব নাই।

তবু কেন কুম্ভ ও মীরার মধ্যে সম্পর্ক জটিল হইয়া উঠে ?

তারই আখ্যান রহিয়াছে আমাদের পরের পুস্তকে—ছোটদের রাজস্থান গ্রন্থমালার অষ্টম বইতে। নাম—

রাণা কুম্ভ